এই সময়

* কথাসরিৎ *

ধর্মসমূহের মধ্যে সারবস্তু কি আছে না আছে তা জানি নে। কিন্তু এদেশে প্রতিনিয়ত চোখে দেখতে পাচ্ছি যে বেশি ধার্মিক হওয়ার মানেই হচ্ছে বেশি সঙ্কীর্ণ হওয়া।

— মুজফ্‌ফর আহমদ

সমাধান?

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বন্দুকের নলের ডগায় কত দিন কোনও অঞ্চলে শান্তি সুনিশ্চিত করা যেতে পারে? দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দশকের পর দশক ধরে আর্মড্‌ ফোরসেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট বা 'আফস্পা' বলবৎ রাখার কেন্দ্রীয় নীতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি যুগান্তকারী রায় থেকে উঠে আসে এই জরুরি প্রশ্নটি। শীর্ষ আদালতের দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য — 'অশান্ত অঞ্চলগুলিতে' আফস্পা বলবৎ করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেনা মোতায়েন রাখা 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে ব্যঙ্গ করারই সামিল'। শুধু তাই নয়, এই রায়ে সুপ্রিম কোর্টের দু'সদস্যের একটি বেঞ্চ আরও জানিয়েছে এই নীতি রাষ্ট্রের ব্যর্থতার পরিচায়ক। আফস্পা নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। বিতর্কের অন্যতম কারণ, বছরের পর বছর ধরে আফস্পা বলবৎ থাকা প্রদেশগুলিতে মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন সব অভিযোগ নথিবদ্ধ করেছেন যা যে কোনও সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে গভীর উদ্বেগজনক। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মণিপুর। এই রায়েই সুপ্রিম কোর্ট বিগত কুড়ি বছরে সেই রাজ্যে ভুয়ো সংঘর্ষে ১৫২৮ ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগের প্রতিটির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, রাজধানী ইম্ফল বাদ দিয়ে মণিপুরের সর্বত্র এবং পার্শ্ববর্তী নাগাল্যান্ডে ১৯৫৮ সাল থেকে আফস্পা বলবৎ রয়েছে। আসামে এবং কাশ্মীরে এই আইন বলবৎ রয়েছে ১৯৯০ সালে থেকে এবং অরুণাচল প্রদেশের তিনটি জেলায় ১৯৯১ সাল থেকে। এই নীতির পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি যে, 'উপদ্রুত অঞ্চল'-এ আফস্পা উল্লঙ্ঘন করে কোনও ব্যক্তি অস্ত্র রাখার অর্থই তিনি রাষ্ট্রের 'শত্রু'। এই যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে 'শত্রুকে হত্যাই সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান নয়'।

শীর্ষ আদালতের এই রায়ের নিরিখে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে প্রতিটি 'উপদ্রুত অঞ্চল'-এর বর্তমান পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালচনা করে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার সমস্ত বিকল্প খতিয়ে দেখা। এর প্রথম এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ মণিপুর এবং অন্যান্য রাজ্যে মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির দ্রুত এবং স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করা, যেন রাষ্ট্রের প্রতি স্থানীয় মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। দীর্ঘকাল আফস্পা বলবৎ থাকার পর ২০১৫ সালে ত্রিপুরায় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই রাজ্যে রাষ্ট্র কোনও গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি। ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা অন্যত্র কী ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তা নিয়ে অবিলম্বে উদ্যোগ নিক সংশ্লিষ্ট সকল মহল।

সমাধান!

নবতম আইন মোতাবেক বাইকচালক বা সঙ্গের আরোহীরা হেলমেট পরিহিত না হলে, পাম্প থেকে তেল মিলবে না। পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশের আরও এক দৃঢ় সংকল্প। বহু বিজ্ঞাপন, প্রচার অভিযান, নিরাপত্তা সপ্তাহ ইত্যাদি আয়োজনের পর এই পদক্ষেপ। নিঃসন্দেহে তাদের সাধুবাদ প্রাপ্য, কিন্তু একই সঙ্গে এটিও স্মর্তব্য, গলদ যদি গোড়ায় হয়, তবে শত নিয়ম থাকলেও, নানাবিধ কড়া পন্থা অবলম্বন করলেও এবং স্বল্প সময়ে সুফল মিললেও, দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য পাওয়া কঠিন। খবরে প্রকাশ, এই আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকেই বেশ কিছু পেট্রোল পাম্পে হেলমেটবিহীনদের তেল দিতে না চাওয়ায় পাম্পকর্মীদের প্রহৃতও হতে হয়েছে। আবার স্রেফ তেল নেওয়ার সময়ে অন্য কোথাও থেকে তেলমোট ঋণ নেওয়াও নাকি প্রায় ক্ষুদ্র শিল্পের আকার ধারণ করতে

গত দেড় বছরে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ধর্মনির্বিশেষে অন্তত সাতচল্লিশ জনকে হত্যা করেছে

সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ, মৌলবাদীরা বিচলিত

নিরীহ মানুষকে হত্যা সাহসের পরিচয় নয়। বরং স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের মতাদর্শগত প্রচারের বিফলতা এবং তাদের নৈরাশ্য। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

উদয় দেব

বাংলাদেশে, ইসলামি কট্টরপন্থীদের একাংশ সম্পূর্ণ উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে গিয়ে কখনও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের আক্রমণ করছে তো কখনও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আহমাদিয়া (কাদিয়ানি) সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে আক্রমণ করছে। নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে এই ধরনের মৌলবাদী হিংসার হাত থেকে বাংলাদেশ মাঝে মাঝে বিরাম পেলেও কোনও এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বাংলাদেশের হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গত দেড় দশকে সন্দেহভাজন ইসলামি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের তরফ থেকে ক্রমাগত হুমকি পাচ্ছে। গত বছর বড়োদিনের আগে অন্তত বারো জন খ্রিস্টান পাদ্রিকে বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। গত ১৫ জুন, ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষকে ইসলামিক স্টেট-এর সমর্থকদের তরফ থেকে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনের পর থেকে আহমেদ রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয় দাস ও নিলয় নীলের মতো মুক্তমনা ব্লগারদের খুন করার পর এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন সময় মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ইসলামি জঙ্গিরা খুন করছে। হামলার লক্ষ্য কখনও মন্দিরের পুরোহিত, কখনও আশ্রম কর্মী, কখনও নাজিমদ্দিন সামাদ নামক এক ব্লগার তথা আইনের ছাত্র, কখনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী, কখনও এক হিন্দু দর্জি, কখনও বাংলাদেশের প্রথম সমকামী পত্রিকার সম্পাদক, কখনও অঙ্কের অধ্যাপক রিপন চক্রবর্তী, কখনও সুনীল গোমস নামক এক খ্রিস্টান মুদি তো কখনও এক পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী মাহমুদা খানম। এই অনবরত ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত ঘটনাগুলোর নবতম সংযোজন হল গত পয়লা জুলাই, গুলশন এলাকার এক অভিজাত ক্যাফে-তে বর্বরোচিত হত্যালীলা আর গত ৭ জুলাই, ফিরোজগঞ্জের ঈদের নামাজের আগে ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী হামলা।

বাংলাদেশের এক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী গত দেড় বছরে, ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীদের দ্বারা খুন হয়েছে অন্তত সাতচল্লিশ জন। এর মধ্যে আটজনকে খুন করার অভিযোগ আল-কায়দাপন্থী আনসার-আল-ইসলামের দিকে আর আঠাশ জনকে খুন করার অভিযোগ আইসিসপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠীর দিকে। আনসার-আল-ইসলামের নেতৃত্বে আছে মেজর জিয়াউল হক, যে ২০১২ সালে, সেনাবাহিনীর ভিতর থেকে এক সামরিক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিল এবং যে এখন বাংলাদেশ সেনা থেকে বিতাড়িত এবং পলাতক। এই আনসার-আল-ইসলাম মূলত উত্তর বাংলাদেশে তাদের কার্যকলাপ চালায় এবং তাদের দলে ভিড়ে যায় 'জামাতুল মুজাহিদিন', 'হেফাজতে ইসলাম' এবং 'আহলে হদিস'-এর মতো ইসলামি গোষ্ঠীর কিছু কর্মী যারা অনেকেই মাদ্রাসায় যাওয়া কিছু গরিব মুসলিম ছাত্র। আনসার-আল-ইসলাম গোষ্ঠীর (যা একসময় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বলে খ্যাত ছিল) আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল মুক্তমনা ব্লগার এবং সমকামী অধিকারের আন্দোলন কর্মীরা। সেই দিক থেকে আইসিসপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতা, বাংলাদেশি-কানাডিয়ান, তামিম চৌধুরীর (শেখ আবু ইব্রাহিম আল-হানিফ বলে খ্যাত) দলে যোগ দেয় প্রধানত কিছু শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ এবং স্থপতি। এই গোষ্ঠীতে অনেক সময় বাংলাদেশ জামাত-এ-ইসলামির ছাত্র সংগঠন, 'ইসলামি ছাত্র শিবিরের' কিছু কর্মীরা যোগ দিয়েছে এবং তাদের গতিবিধির জায়গাগুলো হল মীরপুর, শবর, টঙ্গী ও গাজীপুর। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিদেশি নাগরিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা উদার ধর্মনিরপেক্ষ অধ্যাপক।

বাংলাদেশে, সম্প্রতি লক্ষাধিক মুসলিম উলেমা (ইসলাম ধর্মের পণ্ডিতবর্গ) সোচ্চারে বলেছেন যে ইসলামি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ধর্মের নামে উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ 'হারাম' (নিষিদ্ধ)। মৌলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদ, যিনি বাংলাদেশের জমিয়ত-উল-উলামার সভাপতি তথা কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়াতে সর্ববৃহৎ ঈদের নামাজ পড়ানোর ইমাম, একটি ফতোয়া (ধর্মীয় নির্দেশ) জারি করে বলেছেন যে 'ইসলাম শান্তির ধর্ম', 'ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না', 'কিছু উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের জিহাদি ভেবে ভুল করছে' এবং কুরান ও হাদীস (ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, হজরত মুহম্মদের জীবন ও বাণীর সংকলন) উদ্ধৃত করে বলেছেন যে আত্মহননকারী সন্ত্রাসবাদীরা নরকে যাবে। তিনি এ কথাও বলেছেন যে 'উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী ও খুনের সাহায্যকারী ব্যক্তিদের জানাজায় (শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার আগের প্রার্থনা) সামিল হওয়াও হারাম। এবং যাঁদের উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি রাখার জন্য খুন হতে হয়েছে তারা আসলে শহিদ'। আশার কথা যে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, পুলিশ ৮৫৬৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে যার মধ্যে ১১৯ জন সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী ও ৫৩০০ জন সন্দেহভাজন অপরাধী। তবে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের এহেন পুলিশি গ্রেফতার বহু ক্ষেত্রে, প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির উপরে আওয়ামি লিগ পরিচালিত বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগও সামনে এনে দিয়েছে। যেমন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সে দেশে ইসলামিক স্টেট ও অন্যান্য ঘাতক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে দাবি করছে যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ, বিদেশি যোগের পরিবর্তে দেশের মাটিতে লালিত পালিত হচ্ছে, সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আসলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির যোগাযোগ আছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির দাবি যে সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে সাড়ে আট হাজার গ্রেফতারের মধ্যে তাদের দুই হাজার কর্মীকে অন্যায় ভাবে আটক করা হয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোড়া আক্রমণ বাংলাদেশ সরকার ও উলেমাদের প্রতি একটা বার্তা দেওয়ার অপচেষ্টা। অন্য দিকে জামাত-এ-ইসলামি নেতা, মির কাশেম আলিকে গত ৬ জুন, মৃত্যুদণ্ডের হুকুম শুনিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আগামী পঁচিশ জুলাই, কাশেম আলির ফাঁসিনামা পুনর্বিবেচনার আবেদন শুনবে। তাই এই জোড়া আক্রমণ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টির এক কৌশলও বটে।

> বাংলাদেশের জনতা কিন্তু ভোটের বাক্সে মৌলবাদীদের খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের আক্রমণ করে মৌলবাদীরা বড়োজোর রাজনৈতিক ময়দানে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু গ্রাম মফস্‌সলের সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে তারা বেশ বেগ পায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ইসলামি মৌলবাদীদের যে কোনও কারণেই হোক, খুনজখম করা, বা হুমকি দেওয়ার কে অধিকার দিল? ইসলাম তো শান্তির বার্তা দেয়। কুরানের সুরা আল বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার বলা আছে যে 'ধর্মের ব্যাপারে কোনও বলপ্রয়োগ নয়'। পয়গম্বরের জীবন ও বাণী থেকে এমন কয়েকটা উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে তিনি অনেক অপমান ও কটূক্তিকে উপেক্ষা করেছেন এবং অপমানকারী ও কটূক্তিকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা হলে এই সব ইসলামি মৌলবাদীরা কেমন মুসলমান যারা কুরান হাদীসের কথা মানে না? এরা কেমন ধর্মপ্রাণ মানুষ যারা অন্য মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে খুন করতে উদ্যত হয়?

ধর্ম বা কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিন্দা করার জন্য বা সেই সম্পর্কে কটু কথা বলার জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের হাতে যদি কাউকে খুন হতে হয় অথবা কেউ আশঙ্কাজনক ভাবে আক্রান্ত হন তা হলে সেটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অপরিণত, ভঙ্গুর, এবং অসুরক্ষিত ভাবাবেগই প্রকাশ পায়। এহেন কাণ্ডের জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীরা কিন্তু কোনও দুর্দমনীয় সাহসের পরিচয় দেয় না। বরং তাদের দুর্বলতা, নৈরাশ্য এবং মতাদর্শগত প্রচারের বিফলতা আরও বেশি করে প্রকট হয়। প্রশ্ন হল ইসলামি মৌলবাদীরা কেনই বা ধর্মের নামে কটূক্তি সহ্য করতে পারে না? তারা যদি 'মহাপ্রলয়ের' শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত), যে দিন পাপ পুণ্যের হিসেব হবে তা বিশ্বাস করে তা হলে তো তারা পৃথিবীতে ধর্মের নামে কুৎসাকারী পাপীর শাস্তি, আল্লাহর উপর ছাড়তে পারে। আল্লাহর স্বঘোষিত সেনানী হিসেবে জাহির করে আইন কানুন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার কী প্রয়োজন? আসলে যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার প্রতি ইসলামি মৌলবাদীদের হিংসাত্মক আক্রমণ আজকের পৃথিবীতেই সম্ভব যেখানে মৌলবাদীদের অস্তিত্বকে আধুনিক ও উত্তরআধুনিক জীবনযাত্রা এবং প্রশ্নগুলো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে, আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ও উদার রাজনৈতিক দলগুলোর জোট বিপুল ভোটে জয়ী হবার পরে ধর্মনিরপেক্ষ দাবিগুলো জোরদার হয়। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের একাংশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরই ধারক বাহক হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় যুদ্ধপরাধের জন্য কিছু মৌলবাদীদের ফাঁসির হুকুম হয় তো কারওর আমৃত্যু কারাদণ্ড। উপরন্তু প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি এবং মৌলবাদী শক্তিগুলো কোণঠাসা অবস্থায় ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করে। আর বিরোধীশূন্য অবস্থায় আওয়ামি লিগ ফাঁকা মাঠে গোল দেয়। এই রকম একটা সন্ধিক্ষণে মৌলবাদীরা আরও বিচলিত হয়ে পড়ছে। ধর্ম সম্পর্কে যে কোনও ধরনের মৌখিক আক্রমণকেই তারা নাস্তিকতার প্রচার বলে মনে করছে। যথারীতি, নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তারা যুক্তিবাদী ও তার্কিক আদান প্রদান না করে মানুষ খুন করছে। বাংলাদেশের জনতা কিন্তু ভোটের বাক্সে মৌলবাদীদের খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের আক্রমণ করে মৌলবাদীরা বড়োজোর রাজনৈতিক ময়দানে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু গ্রাম মফস্‌সলের সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে তারা বেশ বেগ পায়।

মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এক দিকে যেমন অনবরত মতাদর্শগত সংগ্রাম দরকার তেমন একই সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক আর্থ-সামাজিক দাবিগুলো যথা বেকারত্ব, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে মজবুত করে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা জরুরি। এক দিনে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে হারজিতের ফয়সলা হবে না কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক